#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

20th April to 25th April 2026

INDEX

1. সাধারণ অধ্যয়ন ২ ______ 01

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা ______ 01

1.1.1. ভারতে ইউনিয়ন প্রথার দুর্বল হওয়া এবং শ্রমিক অধিকারের ওপর তার প্রভাব ______ 01

1.1.2. ভারতের শিক্ষার সংকট: বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং শিক্ষার ফলাফলের মধ্যে ব্যবধান দূর করা ______ 06

1.1.3. গণতন্ত্র এক সন্ধিক্ষণে: পতনের লক্ষণ এবং স্থিতিস্থাপকতার পথ ______ 09

1.1.4. শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী ভোটাধিকার হরণ এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের সামনে চ্যালেঞ্জ ______ 13

2. সাধারণ অধ্যয়ন ৩ ______ 18

2.1. অর্থনীতি ______ 18

2.1.1. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের খরচ: ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা ______ 18

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ভারতে ইউনিয়ন প্রথার দুর্বল হওয়া এবং শ্রমিক অধিকারের ওপর তার প্রভাব

ভূমিকা

- সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারতে শ্রমিকদের এক বিশাল আন্দোলনের ঢেউ দেখা গেছে, যেখানে **ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি (Higher Minimum Wages)**, ব্যাপক **সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security)** এবং কাজের **চুক্তিভিত্তিকরণ (Contractualisation)** বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। বিশেষ করে উৎপাদন (Manufacturing) খাতের এই আন্দোলনগুলি **ট্রেড ইউনিয়নের (Trade Unions)** ভূমিকাকে পুনরায় আলোচনায় নিয়ে এসেছে।
- ইউনিয়ন প্রথার এই দুর্বল হওয়া, যা প্রায়ই **ডি-ইউনিয়নাইজেশন (Deunionisation)** নামে পরিচিত, শ্রমিকদের **দরকষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Power)** হ্রাস এবং তাদের অধিকার খর্ব হওয়া নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

পটভূমি

১. ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ডি-ইউনিয়নাইজেশনের ক্রমবিবর্তন

- ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা হয় **বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে**। এটি মূলত ঔপনিবেশিক শ্রম পরিস্থিতি এবং ভারতের **স্বাধীনতা সংগ্রামের** প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। বস্ত্রকল, রেলওয়ে এবং বন্দরের শ্রমিকরা উন্নত মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং আইনি সুরক্ষার দাবিতে নিজেদের **সমিতি ও ইউনিয়ন (Associations and Unions)** হিসেবে সংগঠিত করতে শুরু করেন।
- **ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬-এর মাধ্যমে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি:** এই আইনের মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রথম আইনি স্বীকৃতি পায়। এতে ট্রেড ইউনিয়নকে এমন এক সমন্বয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা মূলত শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গঠিত হয়। এই আইন নিবন্ধনের (Registration) আইনি ভিত্তি তৈরি করার পাশাপাশি রাষ্ট্রকে ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর **যৌক্তিক বিধিনিষেধ (Reasonable Restrictions)** আরোপের ক্ষমতাও দেয়।
- **স্বাধীনতা-পরবর্তী সংগঠন:** স্বাধীনতার পর **শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (Industrial Disputes Act, 1947)** এবং **ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮ (Minimum Wages Act, 1948)** সংগঠিত শ্রমিকদের জন্য একটি **সুরক্ষামূলক কাঠামো (Protective Framework)** তৈরি করে।
    - **ডিরিজিবল মডেল (Dirigisme Model/রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা)**-এর অধীনে সরকারি খাতের সম্প্রসারণ ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে। তারা **মজুরি নির্ধারণ (Wage Bargaining)**, বিবাদ মীমাংসা এবং নীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।
- **অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর পরিবর্তন:** ১৯৯১ সালের **উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং বিশ্বায়ন (LPG Reforms)** একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।
    - বাজারের প্রতিযোগিতা এবং **শ্রমের নমনীয়তার (Labour Flexibility)** দিকে ঝোঁক বাড়ায় সরকারি খাতের কর্মসংস্থান কমে যায় এবং **আউটসোর্সিং (Outsourcing)**, চুক্তিভিত্তিক শ্রম ও মানহীন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
    - এর ফলে, **অসংগঠিত ক্ষেত্র (Informal Sector)** শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ দখল করে নেয় এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দরকষাকষির ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. **ট্রেড ইউনিয়নের আইনি ভিত্তির সাংবিধানিক বিধান**

- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(গ):** এটি সমিতি বা ইউনিয়ন গঠন করার **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Right) প্রদান করে, যা ট্রেড ইউনিয়নকে সম্মিলিত পদক্ষেপের একটি বৈধ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ১৯(৪):** এটি জনশৃঙ্খলা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার স্বার্থে রাষ্ট্রকে ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর **যৌক্তিক বিধিনিষেধ** আরোপের অনুমতি দেয়।
- **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (DPSP) শ্রম কল্যাণের ওপর জোর দেয়:**
  - **অনুচ্ছেদ ৪৩:** শ্রমিকদের জন্য **জীবনধারণের উপযোগী মজুরি** (Living Wage) এবং মানসম্মত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়।
  - **অনুচ্ছেদ ৪৩এ (43A):** শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণকে (Worker Participation) উৎসাহিত করে, যা **শিল্প গণতন্ত্র** (Industrial Democracy) শক্তিশালী করে।
- এই বিধানগুলি সামগ্রিকভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শ্রমিক কল্যাণের প্রতি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

৩. **ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের পরিধি নির্ধারণে বিচারবিভাগীয় রায়**

- **অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন বনাম ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল (১৯৬২):** সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে, সংগঠন করার অধিকার মৌলিক হলেও, **স্বীকৃতি পাওয়া বা যৌথ দরকষাকষির** (Collective Bargaining) **অধিকার** মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- **কামেশ্বর প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য (১৯৬২):** আদালত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও বলেছে যে, **ধর্মঘট বা স্ট্রাইক** (Strikes) যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- **টি.কে. রঙ্গরাজন বনাম তামিলনাড়ু সরকার (২০০৩):** আদালত রায় দিয়েছে যে, সরকারি কর্মচারীদের **ধর্মঘট করার কোনো মৌলিক অধিকার নেই**, যা শ্রমিকদের আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রক সীমাবদ্ধতাকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে।
- এইভাবে, বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যাগুলি শ্রম অধিকার এবং বৃহত্তর জনস্বার্থের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

সমসাময়িক শ্রমবাজারে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব

১. **যৌথ দরকষাকষি এবং মজুরি নির্ধারণ**

- ট্রেড ইউনিয়নগুলি **যৌথ দরকষাকষির** (Collective Bargaining) প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পরিবর্তে একটি **ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী** (Unified Group) হিসেবে মজুরি, কাজের সময়, চাকরির নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দেয়।
- যখন ইউনিয়নগুলি শক্তিশালী থাকে, তখন নিয়োগকর্তারা **সংলাপে বসতে** (Engage in dialogue) বাধ্য হন এবং একতরফাভাবে কোনো প্রতিকূল শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ কম থাকে।
- শ্রমিকদের স্বার্থকে একত্রিত করার মাধ্যমে, ইউনিয়নগুলি **নিয়োগকর্তার আধিপত্য** (Employer Dominance) প্রতিহত করতে সাহায্য করে এবং **শোষণমূলক মজুরি প্রথা** (Exploitative Wage Practices) প্রতিরোধ করে—বিশেষ করে সেইসব বৃহৎ শিল্পে যেখানে শ্রমের যোগান বেশি কিন্তু শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা কম।
- যৌথ দরকষাকষি **ন্যায্য মজুরি** (Fair Wages), ওভারটাইমের নিয়ম এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, যা **শ্রমের অবমূল্যায়ন** (Undervalued Labour) এবং **মানবেতর কর্মপরিবেশের** (Abusive Working Conditions) ঝুঁকি কমায়।

২. **বিরোধ নিষ্পত্তি এবং শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রীতি**

- ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য **সমঝোতা বোর্ড** (Conciliation Boards), শ্রম আদালত এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ ফোরামে অংশগ্রহণ করে।
- এই **প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা** (Institutionalised Negotiation) শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং নিশ্চিত করে যে বিরোধগুলি দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট বা সহিংস আন্দোলনের পরিবর্তে **আইনি ও সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার** (Legal and Structured Processes) মাধ্যমে সমাধান করা হয়।
- শক্তিশালী ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে বিরোধগুলি প্রায়ই **অমীমাংসিত** (Unresolved) থেকে যায়, যা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট, লকআউট বা সংঘাতের দিকে পরিচালিত করে, যা শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষেরই ক্ষতি করে।
- **আলোচনার স্থিতিশীল মাধ্যমের** (Stable Channels for Negotiation) অভাব শিল্পাঞ্চলগুলিতে সামাজিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী **শিল্প শান্তি** (Industrial Peace) বিঘ্নিত করে।

৩. **সামাজিক নিরাপত্তা এবং নীতিগত সওয়াল**

- ট্রেড ইউনিয়নগুলি **ওকালতি বা সওয়ালকারী সংস্থা** (Advocacy Bodies) হিসেবে কাজ করে, যারা পেনশন স্কিম, স্বাস্থ্য বিমা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং বেকারত্ব সুরক্ষাসহ **সামাজিক সুরক্ষা জালের** (Social Security Nets) বিস্তারের জন্য চাপ দেয়।
- তারা **আইনগত সংস্কার** (Legislative Reforms), শ্রম আইনের আরও ভালো প্রয়োগ এবং অসংগঠিত ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষার জন্য প্রচার চালায়।
- কেরালা এবং তামিলনাড়ুর মতো যেসব রাজ্যে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন রয়েছে, সেখানে শ্রমিকরা ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে **উচ্চতর ন্যূনতম মজুরি** (Higher Minimum Wage Settlements) এবং আরও শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।
- ইউনিয়নগুলি সরকারি প্রকল্প এবং নিয়োগকর্তাদের নিয়মনীতি পালনের বিষয়টি তদারকি করে, যাতে শ্রমিকরা কেবল কাগজে-কলমে নয় বরং বাস্তবেও সুবিধা পায়; এর ফলে **সামাজিক সুরক্ষার ফাঁকফোকরগুলি** (Gaps in Social Protection) পূরণ হয়।

৪. **মনস্তাত্ত্বিক এবং কাঠামোগত ক্ষমতায়ন**

- ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ শ্রমিকদের **মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতায়ন** (Psychological Empowerment) এবং একটি **যৌথ পরিচয়** (Collective Identity) প্রদান করে, যা তাদের অধিকার, আইনি সুরক্ষা এবং আলোচনার কৌশলগুলি বুঝতে সাহায্য করে।
- এটি চাকরি হারানো, বৈষম্য বা হেনস্থার ভয় কমায় এবং শ্রমিকদের তাদের দাবি আদায়ে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
- কাঠামোগতভাবে, শক্তিশালী ইউনিয়নগুলি **ম্যানেজমেন্টের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার** (Arbitrary Managerial Authority) ওপর নজরদারি হিসেবে কাজ করে। তারা নিশ্চিত করে যে ছাঁটাই, বদলি এবং শাস্তিমূলক পদক্ষেপগুলি যেন **স্বচ্ছ প্রক্রিয়া** (Transparent Procedures) এবং যথাযথ নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়।
- এটি কর্মক্ষেত্রে ন্যায্যতা এবং একটি সমমর্যাদার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি, প্রতিনিধিত্ব শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে তাদের **বক্তব্য বা মতপ্রকাশ** (Voice), সক্রিয়তা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে।

ট্রেড ইউনিয়নকরণের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং প্রভাব

১. **ইউনিয়নের ঘনত্ব হ্রাস** (Declining Union Density)

- বর্তমানে মোট শ্রমশক্তির মধ্যে ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার হার মাত্র **৬.৩%**; যার মধ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রে মাত্র ১.৮% এবং সরকারি ক্ষেত্রে ১১.৮%। এই নিম্ন হার মূলত **অসংগঠিত কর্মসংস্থানের** (Informal Employment) প্রসারের প্রতিফলন, যেখানে অর্ধেক বা তার বেশি শ্রমিক কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি, সংবিধিবদ্ধ সুরক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই কাজ করেন।
- অসংগঠিত শ্রমিক—যেমন **কৃষিশ্রমিক, গৃহকর্মী, নির্মাণ শ্রমিক এবং হকারদের** সংগঠিত করা কঠিন, কারণ তারা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন, তাদের মজুরি কম এবং মালিকের সাথে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক নেই।
- **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের** (Micro-enterprises and small-scale industries) বৃদ্ধি ইউনিয়ন গঠনকে আরও জটিল করে তোলে, কারণ এই কর্মক্ষেত্রগুলোতে যৌথ দরকষাকষির জন্য প্রয়োজনীয় পরিধি ও দৃশ্যমানতার অভাব রয়েছে।

২. **বিভাজন, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং গ্রহণযোগ্যতার সংকট**

- ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি **রাজনৈতিক আদর্শের** (Political Lines) ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে বিভক্ত। একই শ্রমশক্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক ফেডারেশন থাকায় অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয়, যা তাদের **দরকষাকষির শক্তি** (Bargaining Strength) কমিয়ে দেয়।
- অনেক শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন হিসেবে না দেখে **রাজনৈতিক দলের শাখা** (Extensions of Political Parties) হিসেবে গণ্য করেন, যা সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে সংশয় ও অনাগ্রহ তৈরি করে। এই **রাজনীতিকরণ** (Politicisation) ইউনিয়নগুলোর বৈধতা ও কার্যকারিতা নষ্ট করে।
- আস্থার এই অভাব সংকটের সময়ে শ্রমিকদের **একত্রিত করার** (Mobilise workers) ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে নীতি নির্ধারণ বা দরকষাকষিতে ইউনিয়নের প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে।

৩. **শ্রম বিধির** (Labour Codes) **অধীনে আইনি ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা**

- সাম্প্রতিক **শ্রম বিধিসমূহ**—মজুরি বিধি, শিল্প সম্পর্ক বিধি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধি এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিধি—ইউনিয়ন প্রথায় বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে।
- একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো ইউনিয়ন গঠনের জন্য **উচ্চতর সীমা** (Higher Threshold): আগে যেখানে মাত্র ৮ জন শ্রমিক মিলে ইউনিয়ন নিবন্ধন করতে পারতেন, নতুন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমশক্তির প্রায় **১০% শ্রমিকের** সমর্থন প্রয়োজন। এর ফলে ছোট ইউনিয়নগুলোর পক্ষে সংবিধিবদ্ধ স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।
- এছাড়া, এই বিধিগুলি কিছু ক্ষেত্রে শ্রম দপ্তরের **রাষ্ট্রীয় তদারকি** (State Supervision) কমিয়ে দিয়েছে, যা ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ভারসাম্য নষ্ট করেছে। বাস্তবে এটি নিয়োগকর্তাদের পক্ষে ক্ষমতার পাল্লা ভারী করতে পারে।

৪. **চুক্তিভিত্তিক শ্রম, গিগ অর্থনীতি এবং নমনীয় কর্মসংস্থান**

- বর্তমানে শ্রমিকদের প্রায়ই প্রধান নিয়োগকর্তার সাথে কোনো **সরাসরি কর্মসংস্থান সম্পর্ক** (Direct Employment Relationships) থাকে না, ফলে ইউনিয়নগুলোর পক্ষে তাদের হয়ে দরকষাকষি করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- মূল কাজগুলো **আউটসোর্স** (Outsourcing) করা এবং শ্রমশক্তির খণ্ডিতকরণ প্রথাগত ইউনিয়ন কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। **গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকরা** (Gig and Platform Workers) ডিজিটাল অ্যাপ ও অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কাজ করেন, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র বা প্রথাগত সুপারভাইজার নেই।

- এই **প্রযুক্তিগত বিচ্ছুরণ** (Technological Dispersion) প্রথাগত যৌথ দরকষাকষির মডেল প্রয়োগ করা কঠিন করে তোলে এবং গিগ কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃত 'নিয়োগকর্তা' কে—তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ট্রেড ইউনিয়ন শক্তিশালী করতে এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কিছু সফল মডেল অনুসরণ করে:

- **নর্ডিক মডেল (সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে):** এই দেশগুলোতে সরকার, মালিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে একটি শক্তিশালী **ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা** (Tripartite Systems) রয়েছে, যা সামাজিক সংলাপ এবং যৌথ দরকষাকষি নিশ্চিত করে।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** জাতীয় শ্রম সম্পর্ক আইন (NLRA) শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার রক্ষা করে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখে।
- **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO):** ILO কনভেনশন নং ৮৭ (সংগঠন করার স্বাধীনতা) এবং নং ৯৮ (যৌথ দরকষাকষির অধিকার)-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শ্রম অধিকার রক্ষার একটি কাঠামো প্রদান করে।

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় আগামীর পথ

ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলির বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে:

- **আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা** (Strengthen Legal Frameworks): শ্রমিক সংগঠন বা ইউনিয়ন গঠনের বাধা (Threshold) কমানোর জন্য **শ্রম বিধি** (Labour Codes) সংশোধন করা প্রয়োজন। এছাড়া নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন বা হুমকি থেকে শ্রমিকদের **সুরক্ষা** নিশ্চিত করতে হবে। **যৌথ দরকষাকষি** (Collective Bargaining) এবং বিরোধ নিষ্পত্তির আইনি ধারাগুলিকে আরও জোরালো করতে হবে।
- **ইউনিয়নকরণ বৃদ্ধি করা** (Promote High Unionisation): সচেতনতা প্রচার, শিক্ষা এবং জনসংযোগের মাধ্যমে **অসংগঠিত ক্ষেত্র** (Informal Sector) এবং তরুণ শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গঠনের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ছোট ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন গঠনের প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানানো প্রয়োজন।
- **সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি** (Enhance Social Security): গিগ (Gig) এবং প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকসহ সকল স্তরের শ্রমিকের জন্য **সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা** (Universal Social Security) স্কিম চালু করতে হবে। বেকারত্ব, স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্যজনিত সুবিধাগুলি যাতে সময়মতো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- **সামাজিক সংলাপ উৎসাহিত করা** (Foster Social Dialogue): সরকার, নিয়োগকর্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন—এই তিন পক্ষকে নিয়ে গঠিত **ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা** (Tripartite Mechanisms) পুনরায় সক্রিয় করতে হবে যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হয়। কর্মক্ষেত্র, শিল্প খাত এবং জাতীয় স্তরে সামাজিক সংলাপকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- **শোষণ প্রতিরোধ করা** (Combat Exploitation): **চুক্তিভিত্তিক শ্রমের** (Contract Labour) বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে এবং অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। শ্রম পরিদর্শন (Labour Inspection) এবং আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
- **শ্রমিক ক্ষমতায়ন** (Empower Workers): শ্রমিকদের অধিকার, যৌথ দরকষাকষি এবং ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ইউনিয়নের নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সাধারণ শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা** (International Collaboration): বিশ্বব্যাপী শ্রমের মানদণ্ড বজায় রাখতে এবং সেরা অনুশীলনগুলি (Best Practices) গ্রহণ করতে **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা** (ILO)-এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

উপসংহার

যদিও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রথাগত ইউনিয়ন কাঠামোকে দুর্বল করেছে, তবুও **ন্যায্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ** নিশ্চিত করতে এদের প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য। তাই একটি ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই শ্রম শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিযোজনযোগ্য কৌশলের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে **পুনরুজ্জীবিত করা (Revitalising)** অত্যন্ত জরুরি।

Q. The weakening of trade unions in India has significantly altered the balance of power in labour markets. Critically examine the causes of declining unionisation and its impact on workers' rights in India. 15 Marks

1.1.2. ভারতের শিক্ষার সংকট: বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং শিক্ষার ফলাফলের মধ্যে ব্যবধান দূর করা

ভূমিকা: অগ্রগতির এক অদ্ভুত বৈপরীত্য

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। **শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act), ২০০৯**-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ১০০ শতাংশের কাছাকাছি (৯৮%-এর বেশি) ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত হয়েছে। তবে এই সংখ্যাগত সাফল্য একটি গভীর **গুণগত সংকটকে** আড়াল করে রাখছে। ASER (Annual Status of Education Report)-এর তথ্য বারবার দেখাচ্ছে যে, পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় ৫০% শিক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বই পড়তে পারে না এবং অনেকেই সাধারণ পাটিগণিত সমাধান করতে হিমশিম খায়। **বিশ্বব্যাংক** এই পরিস্থিতিকে **"লার্নিং পভার্টি"** বা **"শিক্ষার দারিদ্র্য"** হিসেবে বর্ণনা করেছে, যার অর্থ হলো ১০ বছর বয়সের মধ্যে একটি সহজ পাঠ্য পড়ে বোঝার অক্ষমতা।

ভারত এখন এমন এক **'নিম্ন-শিক্ষা ভারসাম্য'**-এর মধ্যে আটকা পড়েছে, যেখানে শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু **মৌলিক দক্ষতা** অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। আসল বিস্ময় এই সংকটের অস্তিত্ব নিয়ে নয়, বরং এটি সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় **তৎপরতার অভাব** নিয়ে।

তাৎপর্য: কেন মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান (FLN) জরুরি?

ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমেরেসি (FLN) বা মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান হলো সেই ভিত্তি যার ওপর ভবিষ্যতের সমস্ত শিক্ষা এবং বিকাশ নির্ভর করে। এর গুরুত্ব বিভিন্ন দিক থেকে অপরিসীম:

১. **সারাজীবনের শিক্ষার জন্য বৌদ্ধিক ভিত্তি** FLN শিশুদের **"পড়তে শেখা"** থেকে **"শেখার জন্য পড়া"**-র স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করে। এই মৌলিক ক্ষমতা না থাকলে উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক দক্ষতা এবং বিষয়ের গভীর জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা** মানসম্মত শিক্ষা সরাসরি অর্থনৈতিক ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, কার্যকরভাবে কাটানো প্রতিটি অতিরিক্ত শিক্ষা বছর একজন ব্যক্তির **উপার্জন ক্ষমতা** উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। তাই দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের **উৎপাদনশীলতা** বাড়াতে FLN একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।

৩. **সামাজিক সমতা এবং ন্যায়বিচার** শিক্ষার নিম্নমানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী, যেমন—**তফসিলি জাতি/উপজাতি (SC/ST)** এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ওপর। দারিদ্র্যের আন্তঃপ্রজন্ম চক্র ভাঙতে এবং সংবিধানের **ধারা ২১-এ (Article 21A)** ও **৪৫**-এর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সর্বজনীন FLN নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

৪. **জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) অর্জন** ভারতের মধ্যক বয়স (median age) বর্তমানে ২৮ বছর, যা দেশের জন্য একটি বিশাল সুযোগ। কিন্তু পর্যাপ্ত মৌলিক দক্ষতা না থাকলে এই তরুণ প্রজন্ম দেশের সম্পদ হওয়ার পরিবর্তে এক বিশাল **কর্মসংস্থানহীন বোঝা** হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৫. **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ শক্তিশালী করা** একজন শিক্ষিত এবং অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিক গণতান্ত্রিক কাজে আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানের **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি** নিশ্চিত করতে পারেন।

৬. **বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং বিকশিত ভারত @২০৪৭ ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'** গড়ার লক্ষ্য পূরণে একটি দক্ষ ও মানিয়ে নিতে সক্ষম কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং বিশ্বজুড়ে ভারতের **প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা** বৃদ্ধির মূল ভিত্তি হলো উচ্চমানের শিক্ষার ফলাফল।

চ্যালেঞ্জ বা বাধা: "তৎপরতার অভাব"-এর স্বরূপ

দৃঢ় নীতিগত লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষার ফলাফল উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তৎপরতা বেশ কিছু কাঠামোগত এবং আচরণগত কারণে এখনো দুর্বল:

১. **রাজনৈতিক অর্থনীতিতে গুরুত্বের অভাব**

- শিক্ষা সংস্কার, বিশেষ করে শিক্ষার মানোন্নয়ন বা লার্নিং আউটকাম উন্নত করার ফলাফল আসতে অনেক বছর সময় লাগে, যা প্রায়ই একটি নির্বাচনী চক্রের সময়ের চেয়েও বেশি।
- তাই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা পরিকাঠামো, ভর্তুকি বা বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের মতো **দৃশ্যমান এবং তাৎক্ষণিক** লাভজনক কাজগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেন, যা ভোটারদের কাছ থেকে দ্রুত স্বীকৃতি এনে দেয়।
- এর ফলে, বৌদ্ধিক বিকাশ বা FLN (মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান)-এর মতো অদৃশ্য বিষয়গুলো নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব ও কম মনোযোগ পায়।

২. **শেখার ঘাটতির অদৃশ্যতা**

- শারীরিক বা বাহ্যিক কোনো অভাবের মতো শিক্ষার ঘাটতি সরাসরি চোখে দেখা যায় না, ফলে এটি জনমনে উদ্বেগ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ তৈরি করতে পারে না।
- ব্ল্যাকবোর্ড থেকে দেখে লেখা বা মুখস্থ করার মতো গতানুগতিক ক্লাসরুমের কাজগুলো একটি **ভুল ধারণা** তৈরি করে যে শিশুটি প্রকৃত অর্থে শিখছে।
- নিয়মিত এবং নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নের অভাবে এই লুকানো ঘাটতিগুলো ধরা পড়ে না, যার ফলে নিম্নমানের ফলাফল অজানাই থেকে যায়।

৩. **তথ্যের অসামঞ্জস্য (Information Asymmetry)**

- **অভিভাবকদের সীমাবদ্ধতা:** অনেক অভিভাবক, বিশেষ করে যারা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, তারা সন্তানের পড়ার বা অংকের সক্ষমতা বিচার করতে পারেন না। তারা মনে করেন নিয়মিত **স্কুলে উপস্থিত** থাকাই হলো প্রকৃত শিক্ষা।
- **সচেতনতার অভাব:** ASER-এর মতো প্রতিবেদনের মানদণ্ড সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তারা নিম্নমানের শিক্ষার ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন না।
- এটি নিচুতলা থেকে দায়বদ্ধতা তৈরির প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়, কারণ স্কুলের ওপর শিক্ষার গুণমান বাড়ানোর জন্য স্থানীয় স্তরে তেমন কোনো চাপ থাকে না।

৪. **সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মধ্যবিত্তের প্রস্থান**

- মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো ব্যক্তিগত বা বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তাদের সরাসরি কোনো স্বার্থ থাকে না।
- এর ফলে, সরকারি স্কুলের গুণমান, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য যেসব প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর প্রয়োজন ছিল, তারা এই ব্যবস্থার বাইরে থেকে যান।
- এটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত চাপ কমিয়ে দেয়।

৫. **"যোগ্যতা"-র ফাঁদ (The "Ability" Trap)**

- শিক্ষার নিম্নমানের জন্য প্রায়ই শিশুর জন্মগত বুদ্ধি বা প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশকে দায়ী করা হয়, কিন্তু স্কুলের কার্যকারিতাকে নয়।
- এটি শিক্ষার গুণমান, পাঠদান পদ্ধতি বা পাঠ্যক্রমের মতো পদ্ধতিগত ত্রুটি থেকে দায়বদ্ধতাকে সরিয়ে দেয়।
- ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত সংস্কারগুলো পিছিয়ে যায় বা গুরুত্ব হারায়।

৬. **দুর্বল জবাবদিহিতা ব্যবস্থা**

- ক্ষমতার কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক এবং প্রশাসকরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন, যেখানে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের প্রভাব থাকে খুবই কম।
- এই ভারসাম্যহীনতা পাঠদানের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলাকে নিরুৎসাহিত করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর নজরদারি কমিয়ে দেয়।
- ফলস্বরূপ, **স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি** (SMC) গুলো শেখার মান উন্নয়নের পরিবর্তে কেবল নিয়ম পালনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৭. **নীতি এবং বাস্তবায়নের মধ্যে দূরত্ব**

- **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০** এবং **নিপুণ ভারত** (NIPUN Bharat) মিশনের মতো পরিকল্পনাগুলো চমৎকার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- তবে তৃণমূল স্তরে তদারকির অভাব, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবে এই নীতিগুলো সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না।

বৈশ্বিক উদাহরণ: ভিয়েতনাম থেকে শিক্ষা

ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, ভিয়েতনাম PISA-এর মতো বৈশ্বিক মূল্যায়নে উন্নত দেশগুলোর সমতুল্য শিক্ষার মান অর্জন করেছে।

ভিয়েতনামের সাফল্যের মূল কারণ:

- **সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম:** অনেক বিষয়ের ওপর ভাসা-ভাসা জ্ঞানের বদলে মূল দক্ষতাগুলোতে (Core Skills) পারদর্শিতা অর্জনে জোর দেওয়া।
- **সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা:** শিক্ষকদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ রাখা হয়, আবার একইসাথে তাদের পেশাগত সম্মান এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সামাজিক গুরুত্ব: শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখা হয়, যা সমাজের সব স্তরে একতাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি তৈরি করে।

শিক্ষার সংকট নিরসনে সরকারের প্রধান উদ্যোগসমূহ

১. **জাতীয় শিক্ষানীতি** (NEP) ২০২০

- **মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান** (FLN)-কে একটি জরুরি জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- এটি মুখস্থ বিদ্যার বদলে দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রকৃত ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দেয়।

২. **নিপুণ ভারত মিশন** (NIPUN Bharat Mission)

- এটি একটি বিশেষ উদ্যোগ যার লক্ষ্য হলো ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন FLN নিশ্চিত করা।
- এটি সরাসরি এই নিবন্ধে আলোচিত শিক্ষার সংকট মোকাবিলায় কাজ করছে।

৩. **দীক্ষা (DIKSHA)**

- ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে।

ভবিষ্যৎ পথ: "সবার জন্য স্কুল" থেকে "সবার জন্য শিক্ষা"

শিক্ষার সংকট দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার প্রয়োজন:

১. **শিক্ষাকে দৃশ্যমান করা:** স্থানীয় স্তরে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুর পড়ার ক্ষমতা জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে, যাতে এটি একটি জরুরি সামাজিক ইস্যুতে পরিণত হয়।

২. **পাঠদান পদ্ধতিতে সংস্কার:** শিশুর বর্তমান শেখার স্তরের ওপর ভিত্তি করে পড়ানোর পদ্ধতি (যেমন—Teaching at the Right Level) গ্রহণ করতে হবে।

৩. **ফলাফল-ভিত্তিক নজরদারি:** পরিকাঠামো বা স্কুলে ভর্তির সংখ্যার বদলে ছাত্রছাত্রীরা কতটুকু শিখল, তার ভিত্তিতে সাফল্যের পরিমাপ করতে হবে।

৪. **স্থানীয় দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি: স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে (SMC)** ক্ষমতা প্রদান এবং বিকেন্দ্রীকৃত শাসনের মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণ বাড়ানো।

৫. **প্রযুক্তি ব্যবহার:** DIKSHA-র মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শেখার ঘাটতি মেটানো।

উপসংহার

কোঠারি কমিশন বলেছিল, "ভারতের ভাগ্য তার শ্রেণীকক্ষে গড়ে উঠছে।" দশকের পর দশক পরেও এই কথাটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ভারত সবাইকে স্কুলে পাঠাতে সফল হয়েছে, কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ হলো সবাইকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। **২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'** গড়ার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আমাদের এই 'স্কুলে যাওয়ার বিভ্রম' থেকে বেরিয়ে এসে 'প্রকৃত শেখার' দিকে এগোতে হবে। প্রতিটি শিশুর মৌলিক দক্ষতা নিশ্চিত করা কেবল একটি শিক্ষাগত লক্ষ্য নয়, এটি একটি **জাতীয় আবশ্যকতা**।

Q. Schooling is not synonymous with learning. In the context of India's education sector, critically examine the structural and behavioral barriers that have resulted in a 'low-learning equilibrium' despite high enrolment rates. 15 Marks

1.1.3. গণতন্ত্র এক সন্ধিক্ষণে: পতনের লক্ষণ এবং স্থিতিস্থাপকতার পথ

ভূমিকা: গণতন্ত্র এক সন্ধিক্ষণে

গণতন্ত্রকে দীর্ঘকাল ধরে শাসনের সবচেয়ে বৈধ রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা অংশগ্রহণ, **জবাবদিহিতা** এবং স্বাধীনতার আদর্শকে ধারণ করে। গত এক শতাব্দীতে এটি বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে সমাজের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিশালী নেতাদের উত্থান, **প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন** হ্রাস এবং অপপ্রচারের বিস্তারের মতো প্রবণতাগুলো গণতন্ত্রের পশ্চাদগমন বা পতন নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। **"অনুদার গণতন্ত্র"**-এর উত্থান এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে, যেখানে নির্বাচন হয় ঠিকই কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়।

গণতন্ত্রের গুরুত্ব: কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে

১. **সম্মতির মাধ্যমে বৈধতা:** গণতন্ত্র তার নৈতিক কর্তৃত্ব পায় জনগণের সম্মতি থেকে। জন লক যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা তখনই যুক্তিসঙ্গত হয় যখন এটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে। এটি গণতন্ত্রকে সহজাতভাবেই **জবাবদিহিমূলক** করে তোলে।

২. **অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা:** গণতন্ত্র বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশ এবং সংগঠনের স্বাধীনতার মতো **নাগরিক স্বাধীনতা** রক্ষা করে, যা নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিরা জনজীবনে অর্থবহভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩. **জনসাধারণের যুক্তিবাদিতার প্ল্যাটফর্ম:** অমর্ত্য সেন জোর দিয়ে বলেছেন যে, গণতন্ত্র কেবল ভোট দেওয়ার বিষয় নয়, বরং এটি **"জনসাধারণের যুক্তিবাদিতা"** (Public reasoning) সম্পর্কে—অর্থাৎ নাগরিকদের বিতর্ক করার, প্রশ্ন করার এবং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা।

৪. **শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার পরিবর্তন:** গণতন্ত্র ভিন্নমতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং **শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের** সুযোগ করে দেয়, যা সহিংস সংঘাতের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৫. **সহজাত এবং যান্ত্রিক মূল্য:** গণতন্ত্র একটি মাধ্যম (জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা) এবং একটি লক্ষ্য (মর্যাদা ও অংশগ্রহণ বজায় রাখা)—উভয় দিক থেকেই মূল্যবান। এটি কেবল একটি ব্যবস্থা নয়, বরং যৌথ জীবনকে সংগঠিত করার একটি মাধ্যম।

মূল বক্তব্য: গণতান্ত্রিক পতনের লক্ষণ

এর গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, বেশ কিছু প্রবণতা নির্দেশ করে যে গণতন্ত্র বর্তমানে চাপের মুখে রয়েছে।

১. **অনুদার গণতন্ত্রের উত্থান:** ফরীদ জাকারিয়ার বর্ণিত **অনুদার গণতন্ত্রের** (Illiberal Democracy) ধারণাটি এমন একটি ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে যেখানে নির্বাচন থাকলেও স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। ভিক্টর অরবানের অধীনে হাঙ্গেরি এর একটি বড় উদাহরণ, যেখানে নির্বাহী ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে।

২. **কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ:** ক্যারিশম্যাটিক বা প্রভাবশালী নেতাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রায়ই আইনসভাকে কোণঠাসা করে দেয় এবং **বিচার বিভাগীয় তদারকিকে** দুর্বল করে। নেতারা অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়াগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারেন, যা জবাবদিহিতাকে কমিয়ে দেয়। এটি ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে নষ্ট করে।

৩. **প্রতিষ্ঠানগুলোর অবক্ষয়:** রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বিচার বিভাগ, সংবাদমাধ্যম এবং নির্বাচন সংস্থাগুলোর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এর ফলে **পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট** বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দুর্বল তদারকি দেখা দিতে পারে। যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়, তখন তারা ক্ষমতার ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

৪. **অপপ্রচার এবং ডিজিটাল কারসাজি:** ভুয়া খবর এবং ভুল তথ্যের দ্রুত বিস্তার একটি বিকৃত পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে নাগরিকদের জন্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। **অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত** (Algorithmic bias) মেরুকরণকারী কন্টেন্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়, যা ভিন্নমতের সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

৫. **রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার হ্রাস:** জোসেফ শুম্পিটার যুক্তি দিয়েছিলেন যে, নাগরিকদের অর্থবহ পছন্দ দেওয়ার জন্য নেতাদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিযোগিতা থাকা প্রয়োজন। যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার বা সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হয়, তখন এই প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়। ফলে গণতন্ত্র কেবল **ভোটের একটি আনুষ্ঠানিকতায়** পরিণত হয়।

আধুনিক গণতন্ত্রের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ

গণতন্ত্রের ওপর চাপগুলো কাঠামোগত এবং উদীয়মান উভয়ই:

১. **সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ এবং সামাজিক মেরুকরণ:** অ্যালেক্সিস ডি টকভিল সতর্ক করেছিলেন যে, অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন **সংখ্যালঘুদের অধিকার** ও স্বার্থকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এটি বর্জন এবং পরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতিকে উৎসাহিত করে এবং সামাজিক বিভাজনকে গভীর করে।

২. **জনমোহিনী নীতির উত্থান (Rise of Populism):** জনমোহিনী রাজনীতি প্রায়ই তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনার চেয়ে আবেগপ্রবণ বর্ণনা এবং **"জনগণ বনাম অভিজাত"** কাঠামোকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর ফলে জটিল নীতিগত বিষয়গুলো সাধারণ স্লোগানে পরিণত হয়, যা গণতন্ত্রের গঠনমূলক আলোচনার মান কমিয়ে দেয়।

৩. **প্রতিযোগিতামূলক শাসন মডেল:** শক্তিশালী এবং কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি বিকল্প শাসন মডেলগুলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেয়ে স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। সংকটের সময়ে এই মডেলগুলোর কার্যকারিতা গণতান্ত্রিক আদর্শের সামনে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

৪. **সত্যের সংকট:** যখন নাগরিকরা মৌলিক তথ্য বা সত্যের বিষয়ে একমত হতে পারে না, তখন অর্থবহ জনবিতর্ক অসম্ভব হয়ে পড়ে। তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনার জায়গা দখল করে নেয় **ভুল তথ্য ও পাল্টাপাল্টি বর্ণনা**, যা গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।

৫. **নাগরিক অংশগ্রহণের হ্রাস:** কম ভোটার উপস্থিতি এবং সীমিত নাগরিক অংশগ্রহণ নেতাদের জবাবদিহিতার চাপ কমিয়ে দেয়। নিষ্ক্রিয় নাগরিকরা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন করতে বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে কম আগ্রহী হন, যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর থেকে দুর্বল করার সুযোগ করে দেয়।

সামনের পথ: গণতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করা

গণতন্ত্রকে শক্তিশালী রাখতে একটি বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. **প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা:** স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া, চাকরির মেয়াদের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষার মাধ্যমে **প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা** নিশ্চিত করতে হবে। এটি বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের মতো সংস্থাগুলোকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে এবং আইনের শাসন বজায় রাখতে সাহায্য করে। শক্তিশালী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করে যে ক্ষমতা যেন একটি কার্যকর **তদারকি ও ভারসাম্য (Checks and Balances)** ব্যবস্থার মধ্যে থাকে।

২. **সাংবিধানিক নৈতিকতার প্রচার: বি. আর. আম্বেদকর** যুক্তি দিয়েছিলেন যে, **সাংবিধানিক নৈতিকতার** সংস্কৃতি ছাড়া কেবল প্রতিষ্ঠানের ওপর ভর করে গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। এর জন্য নাগরিক এবং নেতাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাধীনতা, সমতা এবং আইনের শাসনের মতো মূল্যবোধগুলোকে সম্মান করা প্রয়োজন। এই নৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া আনুষ্ঠানিক কাঠামোগুলো অকার্যকর বা অপব্যবহারের শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৩. **অপপ্রচার মোকাবিলা:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ভুল তথ্যের বিস্তার রোধ করতে পারে এবং ক্ষতিকর কন্টেন্টের জন্য দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারে। **মিডিয়া লিটারেসি** বা সংবাদ মাধ্যমের সাক্ষরতা নাগরিকদের তথ্য যাচাই করতে এবং কারসাজি প্রতিরোধ করতে সক্ষম করে তোলে। অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা বজায় থাকলে জনমতকে অন্যায়ভাবে বিকৃত করা রোধ করা সম্ভব হয়।

৪. **সক্রিয় নাগরিকত্বকে উৎসাহিত করা: জঁ-জ্যাক রুসো** যেমনটি বলেছিলেন, সার্বভৌমত্ব মূলত শাসকদের হাতে নয় বরং জনগণের হাতে থাকে। এর অর্থ হলো নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে, কেবল নীরব দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না। নিরন্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে যে শাসন ব্যবস্থা জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

৫. **অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দায়িত্বশীল শাসন:** বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সমাজের বড় একটি অংশকে অর্থবহ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সমতা এবং সুযোগের প্রকৃত প্রাপ্তির মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করে। গণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং বৈধ রাখতে এই বৈষম্যগুলো দূর করা অপরিহার্য।

৬. **অভিযোজনযোগ্য এবং উন্মুক্ত সমাজ:** গণতন্ত্রকে সমালোচনা ও সংস্কারের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে, যাতে নীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমাগত মূল্যায়ন ও উন্নত করা যায়। **কার্ল পপার** যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, একটি উন্মুক্ত সমাজ যুক্তিনির্ভর বিতর্কের মাধ্যমে নিজের ভুল সংশোধনের ক্ষমতার মাধ্যমেই বিকশিত হয়। এই **স্ব-সংশোধন** করার ক্ষমতাই দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করে।

কেস স্টাডি হিসেবে ভারত: স্থিতিস্থাপক তবুও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গণতন্ত্র

গভীর সামাজিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও গণতন্ত্র কীভাবে টিকে থাকতে পারে, ভারত তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ; যদিও এটি বর্তমানে বেশ কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

১. **সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শিক শক্তি:** ভারতীয় সংবিধান ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। বি. আর. আম্বেদকর যেমন জোর দিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো বাস্তবে বজায় রাখতে **সাংবিধানিক নৈতিকতা** অপরিহার্য।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা এবং নির্বাচনী প্রাণবন্ততা:** ভারত নিয়মিতভাবে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বড় আকারের নির্বাচন আয়োজন করে আসছে। **নির্বাচন কমিশনের** মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে, যা ভারতের নির্বাচনকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক অনুশীলনে পরিণত করেছে।

৩. **বিচার বিভাগ এবং অধিকার-ভিত্তিক কাঠামো:** একটি সক্রিয় বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে অধিকারের পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরেও গণতন্ত্রের সারমর্মকে শক্তিশালী করেছে।

৪. **সম্পদ হিসেবে বৈচিত্র্য:** ভারতের ভাষাগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে **ফেডারেলিজম (যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো)**, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সংরক্ষণের মতো নীতিগুলোর মাধ্যমে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই বহুত্ববাদ গণতন্ত্রকে দুর্বল করার বদলে প্রায়ই আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ প্রশস্ত করেছে।

৫. **উদীয়মান চ্যালেঞ্জ এবং গণতান্ত্রিক চাপ:** একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক চাপ, তথ্যের বিকৃতি এবং সামাজিক মেরুকরণের মতো উদ্বেগগুলো ইঙ্গিত দেয় যে ভারতীয় গণতন্ত্র বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক চাপের প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিষ্ঠানের স্থিতিস্থাপকতা এবং নাগরিক সংস্কৃতির পরীক্ষা নিচ্ছে।

৬. **গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং জনঅংশগ্রহণ:** নির্বাচন, সুশীল সমাজ এবং জনালোচনার মাধ্যমে নাগরিকদের অব্যাহত অংশগ্রহণ গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার মূল চাবিকাঠি। **জওহরলাল নেহরু** যেমন জোর দিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক জীবনের যুক্তিবাদী এবং অংশগ্রহণমূলক চরিত্র বজায় রাখতে **বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি** (Scientific temper) এবং উন্মুক্ত বিতর্ক অপরিহার্য।

উপসংহার: একটি জীবন্ত আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র

উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, *"গণতন্ত্র হলো নিকৃষ্টতম শাসন ব্যবস্থা, তবে অন্য যেসব ব্যবস্থা এ পর্যন্ত চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোর কথা বাদ দিলে।"* এটি নিখুঁত হওয়াকে নয়, বরং এর স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিফলিত করে। গণতন্ত্র আজ চূড়ান্ত পতনের মুখে নয়, বরং একটি রূপান্তরের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর প্রকৃত শক্তি কেবল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয়, বরং অংশগ্রহণ, **জবাবদিহিতা** এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। মহাত্মা গান্ধী যেমনটি বলেছিলেন, গণতন্ত্রের চেতনা ভেতর থেকে আসতে হবে।

Q. The contemporary global trend of 'illiberal democracy' poses a significant challenge to the traditional understanding of constitutionalism. In this context, evaluate the resilience of India's democratic institutions in balancing majoritarian impulses with the principles of constitutional morality. 15 Marks

1.1.4. শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী ভোটাধিকার হরণ এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের সামনে চ্যালেঞ্জ

ভূমিকা

- **সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের** নীতি, যা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে কোনো বৈষম্য ছাড়াই ভোটের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, তা ভারতের গণতন্ত্রের নৈতিক ও **সাংবিধানিক ভিত্তি** গঠন করে; তবে, দ্রুত নগরায়ণ হওয়া এলাকাগুলোতে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অধিকার ক্রমবর্ধমানভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে যা দরিদ্র, **পরিযায়ী** এবং **প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে** বাদ দিয়ে দিচ্ছে।
- ভোটার তালিকার **বিশেষ নিবিড় সংশোধন** (SIR) সংক্রান্ত চলমান বিতর্ক শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী ভোটাধিকার হরণের একটি গভীরতর **কাঠামোগত সংকটকে** উন্মোচিত করেছে, যা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের পক্ষ থেকে জরুরি মনোযোগ দাবি করে।

পটভূমি: ভারতের শহরগুলিতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বোঝা

I. সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের অর্থ

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলতে একটি নির্দিষ্ট বয়সের (ভারতে ১৮ বছর) ঊর্ধ্বে প্রতিটি নাগরিকের জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম বা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়াই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারকে বোঝায়। এটি "একজন ব্যক্তি, একটি ভোট, একটি মূল্য" - এই গণতান্ত্রিক নীতিকে প্রতিফলিত করে, যা রাজনৈতিক সমতা নিশ্চিত করে।

II. স্বাধীনতা-পূর্ব শিকড়: একটি বিতর্কিত অধিকার

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভোটের অধিকার মারাত্মকভাবে সীমিত ছিল—যা সম্পত্তির মালিকানা, কর প্রদান এবং সাক্ষরতার সাথে যুক্ত ছিল। এটি রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে কেবল একটি সংকীর্ণ অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল এবং ভারতীয়দের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে, বিশেষ করে দরিদ্র, দলিত এবং মহিলাদের বাদ দিয়েছিল।

- **ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ (মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার):** এই আইনটি সীমিত ভোটাধিকার প্রবর্তন করেছিল কিন্তু ভোটদানকে একটি ছোট সম্পত্তিবান শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।
- **ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫:** ভোটাধিকার সামান্য প্রসারিত করা হয়েছিল—মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪% পর্যন্ত—কিন্তু দরিদ্র, অধিকাংশ মহিলা এবং ভূমিহীনদের বাদ রাখা অব্যাহত ছিল।
- **গণপরিষদের বিতর্ক (১৯৪৬-১৯৪৯):** ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে গণপরিষদ ঔপনিবেশিক সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তারা সম্পত্তি, সাক্ষরতা, জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গের কোনো যোগ্যতা ছাড়াই সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার গ্রহণ করে—যা একটি নতুন স্বাধীন এবং মূলত নিরক্ষর জাতির জন্য ছিল এক বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার।

III. স্বাধীনতা-পরবর্তী বিবর্তন: ভোটাধিকারের গভীরতা বৃদ্ধি

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২) ছিল বিশ্ব গণতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত। প্রায় ১৭.৩ কোটি ভোটার প্রথমবারের মতো তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলেন, যা ছিল তৎকালীন যে কোনো গণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত বৃহত্তম নির্বাচনী মহড়া।

- **ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ — ৬১তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৮৮:** ভোটের বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রায় ৫ কোটি অতিরিক্ত তরুণ নাগরিককে যুক্ত করে।
- **ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM), ১৯৯৮:** দেশজুড়ে ইভিএম-এর প্রবর্তন নির্বাচনের সহজলভ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

- **সিস্টেমেটিক ভোটার এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন (SVEEP) প্রোগ্রাম, ২০০৯:** ভারতের নির্বাচন কমিশন বিশেষ করে শহরকেন্দ্রিক পরিযায়ী এবং বস্তিবাসীসহ প্রান্তিক ও প্রতিনিধিত্বহীন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভোটার নিবন্ধন এবং অংশগ্রহণ বাড়াতে এই কর্মসূচি চালু করে।
- **ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটির সুপারিশ:** এর ফলে জালিয়াতি রোধ করতে এবং প্রকৃত ভোটার যাতে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতে **ভোটার ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (EPIC)** গৃহীত হয়।

IV. **সাংবিধানিক এবং আইনি কাঠামো**

- **ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ:** এটি প্রধান সাংবিধানিক বিধান যা ১৮ বছরের কম নয় এমন প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ভোটের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।
- **ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ:** এই অনুচ্ছেদটি নির্বাচন কমিশনকে (ECI) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে।
- **ভারতীয় সংবিধানের ৩২৫ অনুচ্ছেদ:** এই অনুচ্ছেদটি ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে নির্বাচনী তালিকা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে।
- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০:** এই আইনটি নির্বাচনী তালিকা তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংশোধন পরিচালনা করে। এটি ভোটার নিবন্ধনের যোগ্যতা এবং নাম অন্তর্ভুক্ত ও বাদ দেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করে।
- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১:** এই আইনটি প্রার্থীদের যোগ্যতা, অপরাধ এবং নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি সহ নির্বাচনের প্রকৃত পরিচালনা পরিচালনা করে।

V. **গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় রায়**

- **মোহন লাল ত্রিপাঠী বনাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রায়বেরেলি (১৯৯২):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ভোটের অধিকার একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার হলেও এটি কোনো সাধারণ অধিকার নয়—এটি সর্বোচ্চ তাৎপর্যের একটি সাংবিধানিক অধিকার।
- **পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (PUCL) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০৩):** সুপ্রিম কোর্ট প্রার্থীদের অপরাধমূলক পূর্বসূরী, সম্পদ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা জানার ভোটারদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- **লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৩):** সুপ্রিম কোর্ট জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৮(৪) ধারা বাতিল করে। আদালত জানায় যে কোনো সংসদ সদস্য বা বিধায়ক যদি কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং দুই বা ততোধিক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তবে তিনি অবিলম্বে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

ভারতে শহরকেন্দ্রিক সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের তাৎপর্য

শহরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ শহরে বৈচিত্র্যময়, গতিশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি থাকে, যার ফলে ন্যায়সঙ্গত শাসনের জন্য নির্বাচনী অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর:** সর্বজনীন ভোটাধিকার বস্তিবাসী, পরিযায়ী শ্রমিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষদের এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম করে যারা আবাসন, জল, স্যানিটেশন এবং জীবিকার মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। এটি নগর শাসনকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।
- **অর্থনৈতিক ন্যায়ের হাতিয়ার:** ভোটের অধিকার রাজনৈতিক সমতাকে অর্থনৈতিক দাবিতে রূপান্তরিত করে। এটি দুর্বল গোষ্ঠীগুলোকে উন্নত মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের দাবি করার সুযোগ দেয়, যা গণতন্ত্রকে বাস্তব ফলাফলের সাথে যুক্ত করে।
- **জবাবদিহিমূলক নগর শাসন নিশ্চিত করা:** পৌর নিগমের মতো শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলো তখনই প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক এবং দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে, যখন পরিযায়ী এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়সহ সমস্ত অংশ সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

- **পরিযায়ী জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব:** বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, ২০৩১ সালের মধ্যে ভারতের শহরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা প্রায় **৬০ কোটি (600 million)** পৌঁছানোর পূর্বাভাস রয়েছে। তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য, যাতে শাসনব্যবস্থা তাদের চাহিদাকে প্রতিফলিত করতে পারে যারা শহরের অর্থনীতিকে সচল রাখে।
- **গণতান্ত্রিক বৈধতা এবং সামাজিক সংহতি শক্তিশালী করা:** অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা তৈরি করে এবং সামাজিক চুক্তিকে শক্তিশালী করে। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে বাদ দিলে তা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক বৈধতাকে দুর্বল করে।
- **অন্যান্য অধিকারের প্রবেশদ্বার:** ভোটার তালিকায় নাম থাকা প্রায়শই কল্যাণমূলক প্রকল্প, আবাসন সুবিধা এবং পরিচয়পত্র-সংযুক্ত পরিষেবাগুলি পেতে সহায়তা করে। ফলে ভোটের অধিকার ব্যাপক আর্থ-সামাজিক অধিকার লাভের একটি মৌলিক মাধ্যম হয়ে ওঠে।

শহরকেন্দ্রিক ভোটাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অখণ্ডতার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **SIR প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহরকেন্দ্রিক দরিদ্রদের বর্জন:**

ভোটার তালিকার **বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)**, যা নির্ভুলতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক দরিদ্র, পরিযায়ী শ্রমিক এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে বর্জনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ হলো বসবাসের কঠোর নথিভুক্ত প্রমাণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা।

- **বিপুল পরিমাণে নাম বাদ দেওয়ার প্রবণতা:** সাম্প্রতিক তথ্য প্রধান শিল্প ও মহানগর কেন্দ্রগুলিতে ভোটার বাদ দেওয়ার একটি চমকপ্রদ চিত্র তুলে ধরে:
  - **গাজিয়াবাদ (UP):** ৩৬.৬৭% ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, যা মূলত ভ্রাম্যমাণ কর্মীবাহিনীকে প্রভাবিত করেছে।
  - **লখনউ (UP):** সংশোধনের পর ৩০.৮৮% নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
  - **পাটনা (বিহার):** খসড়া তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক ১৬.৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
  - **মুম্বাই (মহারাষ্ট্র):** ২০২৫ সালের SIR-এর অধীনে ১৪ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে; বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক আবাসনের (Informal housing) বাসিন্দাদের প্রায় ৫০% অনিবন্ধিত বা তালিকাচ্যুত।
  - **গুলশান কলোনি (কলকাতা):** একটি চরম উদাহরণ যেখানে ৯০% ভোটার তালিকা থেকে নিখোঁজ পাওয়া গেছে।
- **প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর অসম প্রভাব:** দলিত, সংখ্যালঘু এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের মতো দুর্বল গোষ্ঠীগুলো দ্বৈত বোঝার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা প্রথমত নিবন্ধনের সময় সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং দ্বিতীয়ত তাদের নাম বাদ পড়ার হারও অনেক বেশি।

২. **কঠোর নথিপত্রের মাধ্যমে নির্বাচনী ছাঁটাই:**

SIR প্রক্রিয়ার ফলে ভোটারদের একটি বাছাইকৃত ছাঁটাই ঘটে, যেখানে নথিপত্রের কঠোর প্রয়োজনীয়তা দরিদ্র এবং পরিযায়ী জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে দেয়।

- **কঠোর নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তা:** দীর্ঘমেয়াদী বসবাসের প্রমাণ (যেমন ২০০২ বা ২০০৫ সালের নথি) দেওয়া পরিযায়ী এবং বস্তিবাসীদের জন্য প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- **কাঠামোগত বাধা হিসেবে পরিযান:** যেহেতু অভ্যন্তরীণ পরিযান নগরায়ণের কেন্দ্রবিন্দু, তাই স্থায়ী বসবাসের প্রমাণ চাওয়ার বিষয়টি পরিযায়ী শ্রমিকদের অসমভাবে বর্জন করে।
- **অনানুষ্ঠানিক বসতি ও তথ্যের বাস্তবতা:** বিশ্বব্যাংকের মতে, শহরের জনসংখ্যার প্রায় ৪০% বস্তিতে বাস করে। বর্তমান ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক ঠিকানার প্রমাণের অভাবে তাদের ব্যাপক বর্জন অনিবার্য হয়ে পড়ছে।

৩. **ব্যালটের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হওয়া:**

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য **গোপন ব্যালটের** নীতি অপরিহার্য, যা শহুরে প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।

- **বুথ-ভিত্তিক তথ্য প্রকাশ:** ছোট বা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বুথ-ভিত্তিক ভোটের ধরণ বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোটদানের আচরণ অনুমান করা সম্ভব হয়। এটি ভোটারদের চাপ, ভীতি প্রদর্শন বা প্রতিশোধের মুখে ফেলতে পারে।

৪. **শহুরে যুবকদের বর্জন এবং অংশগ্রহণের ঘাটতি:**

- ভারতের শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ২৮% ১৮ বছরের নিচে, যারা ভোট দেওয়ার অযোগ্য। যখন এর সাথে ভোটার নিবন্ধন না করা এবং নাম বাদ পড়ার বিষয়টি যুক্ত হয়, তখন মোট জনসংখ্যা এবং প্রকৃত নির্বাচনী অংশগ্রহণের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান তৈরি হয়, যা গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বকে দুর্বল করে।

৫. **দুর্বল শহরকেন্দ্রিক নির্বাচনী পরিকাঠামো:**

- **নিম্ন ভোটার নিবন্ধন:** উচ্চ গতিশীলতা এবং বস্তি এলাকায় পৌঁছানোর সীমাবদ্ধতার কারণে শহরাঞ্চলে নিবন্ধনের হার কম।
- **পরিযায়ী ভোটিং কাঠামোর অভাব:** একটি বহনযোগ্য (Portable) ভোটার নিবন্ধন ব্যবস্থার অভাবে পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের নিজ নির্বাচনী এলাকায় নিবন্ধিত থাকতে বাধ্য হন। ফলে তারা কার্যত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী অংশগ্রহণে বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ

- **কানাডা — প্রোঅ্যাক্টিভ এনিউমারেশন মডেল (Proactive Enumeration Model):** কানাডায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে নির্বাচন কর্মকর্তারা সক্রিয়ভাবে নাগরিকদের কাছে পৌঁছান, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের এবং অস্থায়ী বসতির মানুষদের কাছে। এটি নিবন্ধনের বোঝা কমায় এবং ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে।
- **ব্রাজিল — সুগম্যতাসহ বাধ্যতামূলক ভোটদান (Compulsory Voting with Accessibility):** ব্রাজিল বাধ্যতামূলক ভোটদানের সাথে বস্তি এবং অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে বিশেষ প্রচারণার সমন্বয় ঘটায়। এর ফলে উচ্চ নির্বাচনী অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং প্রমাণিত হয় যে প্রশাসনিক সহায়তা কাঠামোগত বর্জনকে কাটিয়ে উঠতে পারে।
- **এস্তোনিয়া — ডিজিটাল এবং রিমোট ভোটিং সিস্টেম:** এস্তোনিয়া অনলাইন ভোটার নিবন্ধন এবং রিমোট ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে নাগরিকরা যেকোনো স্থান থেকে ভোট দিতে পারেন, যা বিশেষ করে ভ্রাম্যমাণ এবং পরিযায়ী জনসংখ্যার জন্য নির্বাচনী সুযোগ নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যতের পথ: অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটাধিকারের কৌশল

- **অন্তর্ভুক্তির দিকে SIR প্রক্রিয়ার সংস্কার:** ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়াকে নথিপত্র-নির্ভর মডেল থেকে সরিয়ে একটি 'প্রোঅ্যাক্টিভ আউটরিচ' বা সক্রিয় প্রচারণার দিকে নিয়ে যেতে হবে। কর্মকর্তাদের সরাসরি বস্তি, শ্রমবাজার এবং অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে গিয়ে নিবন্ধন অভিযান পরিচালনা করতে হবে।
- **বাসস্থানের প্রমাণের সরলীকরণ:** প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার টি.এন. শেষনের দর্শন অনুসরণ করে ঠিকানার সংজ্ঞা হওয়া উচিত "যেখানে ব্যক্তি বসবাস করেন"। বস্তিবাসীদের জন্য স্ব-ঘোষণা (Self-declaration) বা সামাজিক যাচাইকরণকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- **টোটালাইজার (Totalizer) মেশিনের প্রবর্তন:** ভোটাধিকারের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের উচিত 'টোটালাইজার' ব্যবহার করা। এটি ফলাফল ঘোষণার আগে বেশ কয়েকটি ইভিএম (EVM)-এর ভোটকে একত্রিত করে ফেলে।
- **পরিযায়ীদের জন্য বহনযোগ্য (Portable) ভোটার নিবন্ধন:** জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ সংশোধন করে একটি বহনযোগ্য নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এতে পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের আদি নিবন্ধন না হারিয়েই কর্মস্থলে বা বর্তমান বাসস্থানে ভোট দিতে পারবেন।

- **ডিজিটাল ডেটাবেসের সাথে ভোটার তালিকার সংহতি:** ভোটার তালিকার সাথে [Aadhaar Redacted], ১০০ দিনের কাজের (MGNREGA) রেকর্ড, নগর সংস্থাগুলোর তথ্য এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধনের (NPR) সংযোগ স্থাপন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালিকা আপডেট করা সম্ভব হবে।
- **নাম বাতিলের আগে সঠিক প্রক্রিয়া (Due Process) নিশ্চিত করা:** আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে যে, ভোটার তালিকা থেকে কোনো নাম বাদ দেওয়ার আগে অবশ্যই: ১. ব্যক্তিগত নোটিশ, ২. ক্ষেত্র যাচাই (Field verification), এবং ৩. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটি গণহারে নাম কাটা রোধ করবে।
- **ব্যালটের গোপনীয়তা শক্তিশালী করা:** বুথ-ভিত্তিক তথ্যের বেনামীকরণ বা একত্রীকরণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোটদানের ধরণ অনুমান করা না যায়। এতে ভোটারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকবে।
- **সুশীল সমাজের ভূমিকা বৃদ্ধি:** সুশীল সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষণ, নাম বাতিলের অডিট এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

উপসংহার

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কেবল একটি সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নয়, বরং এটি ভারতের গণতান্ত্রিক পরিচয়ের ভিত্তি। তবে, যখন প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলো দুর্বল নাগরিকদের অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে, তখন এই অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই নগর নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার, সক্রিয় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি নাগরিকের সমান ভোটাধিকার রক্ষা করা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং গণতান্ত্রিক প্রয়োজন। কারণ গণতন্ত্রের শক্তি এবং বৈধতা শেষ পর্যন্ত তার ভোটাধিকারের ব্যাপকতা এবং অখণ্ডতার ওপর নির্ভর করে।

Q. Universal Adult Franchise is the cornerstone of Indian democracy, yet urban electoral processes are leading to increasing disenfranchisement." Examine the challenges and suggest reforms. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের খরচ: ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা

ভূমিকা: মূল্য স্থিতিশীলতার অসম মূল্য

মহামারী-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন, বিশাল আর্থিক প্রণোদনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন **ফেডারেল রিজার্ভ, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড** এবং **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সুদের হার বাড়িয়ে কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণ করে।

২০২৫ সালের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন দেশে কমে আসে। তবে, এই মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনার অর্থনৈতিক খরচ সব দেশে সমান ছিল না। এটি মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যকার ভারসাম্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে।

স্যাক্রিফাইস রেশিও (Sacrifice Ratio) বা 'ত্যাগের অনুপাত' বোঝা

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের খরচ পরিমাপ করার প্রধান উপায় হলো **স্যাক্রিফাইস রেশিও**। এটি মূলত মুদ্রাস্ফীতি ১ শতাংশ কমাতে গিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনের (জিডিপি) কতটা ক্ষতি হলো বা বেকারত্ব কতটা বাড়ল, তা পরিমাপ করে।

উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রাস্ফীতি ১% কমাতে গিয়ে যদি জিডিপির ক্ষতি ২% হয়, তবে স্যাক্রিফাইস রেশিও হবে ২। এটি নীতি-নির্ধারকদের বুঝতে সাহায্য করে যে মুদ্রাস্ফীতি কমানো একটি অর্থনীতির জন্য কতটা বেদনাদায়ক।

- **নিম্ন স্যাক্রিফাইস রেশিও:** এর অর্থ হলো অর্থনীতিতে বড় কোনো ক্ষতি ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
- **উচ্চ স্যাক্রিফাইস রেশিও:** এর অর্থ হলো মুদ্রাস্ফীতি কমাতে গিয়ে জিডিপির বড় ক্ষতি হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়েছে।

আধুনিক মুদ্রানীতির মূল সংকট হলো—কোনো কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। দাম স্থিতিশীল করার প্রতিটি প্রচেষ্টায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। নীতি-নির্ধারকদের লক্ষ্য কেবল মুদ্রাস্ফীতি কমানো নয়, বরং অর্থনীতির জন্য **ন্যূনতম খরচে** তা অর্জন করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা: একটি বিরল 'সফট ল্যান্ডিং'

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ২০২২ সালের শুরু থেকে সুদের হার শূন্যের কাছাকাছি থেকে বাড়িয়ে ২০২৩ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ৫.২৫–৫.৫০% করে। ১১ বার সুদের হার বাড়ানো সত্ত্বেও মার্কিন অর্থনীতি বড় কোনো মন্দা ছাড়াই টিকে যায়, যা অনেকের কাছেই প্রত্যাশিত ছিল না।

সাফল্যের কারণসমূহ:

- **সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট দ্রুত সমাধান:** শিপিং, লজিস্টিকস এবং উৎপাদনের সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে। বন্দরগুলো সচল হওয়ায় পণ্য পরিবহনের খরচ কমে যায় এবং বাজারে পণ্যের জোগান বাড়ে। এতে চাহিদা কমিয়ে আনার আগেই সরবরাহ বাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি কমতে শুরু করে।

- **বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম হ্রাস:** অপরিশোধিত তেল এবং গ্যাসের দাম কমায় পরিবহন ও উৎপাদন খরচ কমে যায়। যেহেতু জ্বালানি প্রায় সব পণ্যের সাথেই যুক্ত, তাই এটি মুদ্রাস্ফীতি কমাতে বড় ভূমিকা রাখে।
- **শক্তিশালী শ্রমবাজার এবং ভোক্তা চাহিদা:** বেকারত্বের হার কম থাকা এবং আয়ের ধারাবাহিকতা বজায় থাকায় মানুষের কেনাকাটার ক্ষমতা কমেনি। ফলে মুদ্রাস্ফীতি কমলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল এবং মন্দা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ফলাফল: উৎপাদনের বড় কোনো ক্ষতি ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর অর্থ হলো মার্কিন অর্থনীতি মন্দা বা ব্যাপক বেকারত্বের সম্মুখীন হয়নি। একে **"সফট ল্যান্ডিং"** বলা হয়, যেখানে প্রবৃদ্ধির ক্ষতি না করেই মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা হয়েছে। তবে মুদ্রাস্ফীতি কমলেও জিনিসের দাম আগের জায়গায় ফিরে যায়নি, বরং একটি উচ্চ স্তরে স্থির হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষকে খাদ্য ও জ্বালানির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য বর্ধিত খরচ বহন করতে হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতা: মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের চড়া মূল্য

ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকেই সক্রিয় হয়ে সুদের হার ০.১% থেকে বাড়িয়ে ২০২৩ সালের অগাস্টে ৫.২৫% করে। তবে এত কঠোর ব্যবস্থার পরেও মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ রয়ে যায়।

কাঠামোগত বাধাগুলো ছিল প্রধান কারণ:

- যুক্তরাজ্য জ্বালানির জন্য আমদানির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হওয়ায় বিশ্ববাজারে গ্যাস ও তেলের দাম বাড়লে তারা বড় ধাক্কা খায়।
- ইউরোপীয় গ্যাস সংকটের কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ ও শিল্পের উৎপাদন ব্যয় আকাশছোঁয়া হয়ে যায়।
- একই সময়ে শ্রমিকের অভাবে মজুরি বেড়ে যায়, যা সেবামূলক খাতে মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উসকে দেয়।

ফলাফল:

- ২০২৩ সালের শেষের দিকে অর্থনীতি **মন্দার** কবলে পড়ে।
- ব্যবসায়িক মন্দার কারণে **বেকারত্ব** বৃদ্ধি পায়।
- এত কিছু সত্ত্বেও ২০২৬ সাল পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যের উপরে ছিল।

অর্থাৎ, যুক্তরাজ্যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য জিডিপির বড় ক্ষতি হয়েছে, তাই এখানে **স্যাক্রিফাইস রেশিও অনেক বেশি** ছিল।

ভারতের অবস্থান: একটি পরিমিত ভারসাম্য

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে রেপো রেট ৪% থেকে বাড়িয়ে ৬.৫% করে। এরপর তারা পরিস্থিতি বুঝে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ফলাফল:

- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** প্রবৃদ্ধি ৮% থেকে কমে প্রায় ৬.৫% হয়েছে, যা একটি ধীরগতি নির্দেশ করে কিন্তু সংকোচন বা মন্দা নয়।
- **মুদ্রাস্ফীতি:** ২০২৫ সালের মাঝামাঝি নাগাদ মুদ্রাস্ফীতি কমে প্রায় ২% এর কাছাকাছি চলে আসে।
- ভারত মন্দা এড়িয়ে **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা** বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কেন স্যাক্রিফাইস রেশিও কম মনে হচ্ছে:

- **ধীরগতির আর্থিক সঞ্চালন (Monetary Transmission):** সুদের হারের পরিবর্তন ভারতের সাধারণ মানুষের ঋণ বা বিনিয়োগের ওপর প্রভাব ফেলতে উন্নত দেশের তুলনায় বেশি সময় নেয়।

- **খাদ্যপণ্যের উচ্চ প্রভাব (CPI ~৪৬%):** ভারতের মুদ্রাস্ফীতির বড় অংশই নির্ভর করে বর্ষা, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (MSP) ওপর, যা কেবল সুদের হার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।
- **সরকারি হস্তক্ষেপ:** বাফার স্টক বজায় রাখা, ভর্তুকি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

স্যাক্রিফাইস রেশিও বা 'ত্যাগের অনুপাত'-এর সীমাবদ্ধতা

ম্যাক্রো-ইকোনমিক্স বা সামষ্টিক অর্থনীতিতে **স্যাক্রিফাইস রেশিও** একটি দরকারী হাতিয়ার হলেও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

১. **ঘটনার পরে অনুমান করা হয় (ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না):** স্যাক্রিফাইস রেশিও সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি কমে যাওয়ার পরে ঐতিহাসিক তথ্য (জিডিপির ক্ষতি এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ডেটা) ব্যবহার করে গণনা করা হয়। নীতি-নির্ধারকরা আগে থেকে এর সঠিক মান জানতে পারেন না, ফলে রিয়েল-টাইম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি নিখুঁত নির্দেশিকা হতে পারে না।

২. **মুদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদনের স্থিতিশীল সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল:** এটি ধরে নেয় যে মুদ্রাস্ফীতি এবং উৎপাদনের মধ্যে একটি অনুমানযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে (যা প্রায়ই **ফিলিপস কার্ভ** থেকে নেওয়া হয়)। তবে কাঠামোগত পরিবর্তন, বিশ্বায়ন বা সরবরাহের সংকটের কারণে এই সম্পর্ক বদলে যেতে পারে, যার ফলে এই অনুপাতটি অস্থির হয়ে পড়ে।

৩. **বণ্টনমূলক প্রভাবকে উপেক্ষা করে:** এই অনুপাতটি মোট উৎপাদনের ক্ষতি পরিমাপ করে ঠিকই, কিন্তু এই ক্ষতির বোঝা আসলে **কার ওপর পড়ছে** তা স্পষ্ট করে না। বাস্তবে এই বোঝা সমানভাবে বন্টিত হয় না—শ্রমিকরা বেকারত্বের মুখে পড়তে পারেন, ছোট প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং নির্দিষ্ট কিছু খাত (যেমন- নির্মাণ শিল্প বা MSME) অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মুদ্রানীতির চ্যালেঞ্জ এবং উদীয়মান চাপসমূহ

১. **সরবরাহ সংকটের বিরুদ্ধে সীমিত কার্যকারিতা:** সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় অংশ সরবরাহ-জনিত কারণে ঘটেছে (যেমন- জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা)। সুদের হার বৃদ্ধি মূলত চাহিদাকে কমিয়ে দেয়, কিন্তু এটি সরাসরি সরবরাহের সমস্যা সমাধান করতে পারে না। ফলে এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি কম কার্যকর হয়।

২. **প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির মধ্যকার অসম ভারসাম্য:** সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব বিভিন্ন দেশে ভিন্নভাবে দেখা গেছে:
   - **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** একটি 'সফট ল্যান্ডিং' নিশ্চিত করতে পেরেছে, অর্থাৎ মন্দা ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।
   - **যুক্তরাজ্য:** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে মন্দা এবং বেকারত্বের মতো চড়া মূল্য দিতে হয়েছে।
   - **ভারত:** একটি ভারসাম্যপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেছে—প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমলেও মুদ্রাস্ফীতি কমেছে এবং বড় কোনো ক্ষতি হয়নি।

৩. **ভারতের মুদ্রার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ:** ভারত বর্তমানে বিনিময় হারের অবমূল্যায়নের সম্মুখীন হচ্ছে, অর্থাৎ **টাকার মান কমে যাচ্ছে**। এর ফলে আমদানির খরচ (বিশেষ করে অপরিশোধিত তেল) বেড়ে যাচ্ছে, যা 'আমদানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি' এবং বহিঃবাণিজ্য খাতে ঝুঁকি তৈরি করছে।

৪. **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (RBI) নীতিগত উভয়সংকট:** আরবিআই বর্তমানে একটি জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছে:
   - সুদের হার **কমালে** প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারে, কিন্তু টাকার মান আরও কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
   - সুদের হার **বাড়ালে** মুদ্রার মান স্থিতিশীল হতে পারে, কিন্তু প্রবৃদ্ধির গতি কমে যেতে পারে।
   - কোনো পরিবর্তন না করলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিলম্বিত হতে পারে।

৫. **মুদ্রানীতির কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা:** ভারতে মুদ্রাস্ফীতির প্রায় অর্ধেকই নির্ভর করে **খাদ্যপণ্যের দামের** ওপর। এটি মূলত বর্ষা, সরবরাহের অবস্থা এবং সরকারি নীতির ওপর নির্ভরশীল, যা কেবল সুদের হার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি কাঠামোর দিকে

১. **সরবরাহ-ভিত্তিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** ভারতের মতো দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রায়ই অতিরিক্ত চাহিদার বদলে সরবরাহের সংকটের কারণে হয়। তাই কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা (গুদামজাতকরণ, লজিস্টিকস, কোল্ড চেইন) উন্নত করলে খাদ্যের দাম স্থিতিশীল থাকবে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ালে আমদানিকৃত তেলের ওপর নির্ভরতা কমবে।

২. **মুদ্রানীতির সঞ্চালন (Monetary Transmission) বৃদ্ধি:** রিজার্ভ ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন যাতে দ্রুত বাজারে কার্যকর হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য শক্তিশালী আর্থিক বাজার এবং দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে সুদের হারের সুবিধা সাধারণ ব্যবসা এবং গ্রাহকদের কাছে সময়মতো পৌঁছায়।

৩. **সমন্বিত নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি:** কেবল মুদ্রানীতি দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এর সাথে **রাজস্ব নীতিকেও (Fiscal Policy)** যুক্ত করতে হবে (যেমন- নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর ট্যাক্স কমানো)। ঢালাও সুযোগ-সুবিধার বদলে লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি প্রদান করা উচিত যাতে দরিদ্র মানুষ সুরক্ষিত থাকে।

৪. **বৈদেশিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** বিশ্ববাজারের ধাক্কা সামলাতে দেশগুলোকে পর্যাপ্ত **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ** গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

৫. **নমনীয় মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা (Flexible Inflation Targeting):** মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতের মতো দেশে যেখানে খাদ্যপণ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি, সেখানে কঠোর লক্ষ্যমাত্রা প্রবৃদ্ধির ক্ষতি করতে পারে। তাই প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি নমনীয় পদ্ধতি প্রয়োজন।

উপসংহার: ভিন্ন পথ, ভিন্ন খরচ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ভারতের অভিজ্ঞতা দেখায় যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ একটি সাধারণ লক্ষ্য হলেও এটি অর্জনের খরচ দেশভেদে ভিন্ন হয়। কাঠামোগত কারণ এবং সঠিক নীতি নির্ধারণের ওপরই এর সাফল্য নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নমনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কারণ মূল্য স্থিতিশীলতার পথ সবার জন্য এক নয় এবং এটি সবসময় বিনাশর্তে আসে না।

*Q. **The cost of disinflation varies significantly across economies depending on structural and policy factors.** Discuss this statement using the experiences of India, the United States, and the United Kingdom. 15 Marks*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video